

# রিল্যাক্স অ্যান্ড হ্যাপি

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের খোঁজে

মূল : মুহাম্মাদ আল গাজালি

ভাষান্তর : সাদিকুর রহমান খান



## সূচিপত্র

সকালটা হোক নতুন কিছু শুরু	১৯
দিনের কাজ দিনেই শেষ করুন	২৭
দুঃখ যদি আসে? আসুক	৩৩
দুশ্চিন্তাকে ছুটি দিন	৩৯
যখন আমার ক্লান্ত চরণ...	৪৭
থিওরি নয়; 'জীবন' হোক জ্ঞানের উৎস	৪৮
শূন্য হৃদয়ে ফুটুক সুন্দরের ফুল	৬৪
ছোটো ছোটো বালুকা, বিন্দু বিন্দু জল	৬৯
নিয়তি	৭৩
পথচলা হোক সত্য ও সুন্দরের সাথে	৮৪
জীবনের রং, রঙের জীবন	৯৫
মহানুভবতার মূল্য কিংবা সহনশীলতার পুরস্কার	১০৪
উদ্দেশ্য হোক আল্লাহ তায়ালায় সম্ভৃতি	১১৪
নিজেকে বিক্রির বিজ্ঞাপন	১২৩
এই পৃথিবীতে আপনি অনন্য একজন	১৩১
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে	১৪০
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি	১৪৪
ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তবতার সংঘাত	১৫৬
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব	১৬১
নবিজির আধ্যাত্মিকতা	১৭৮
ফলবান গাছেই মানুষ ঢিল ছোড়ে	১৮৪
অহেতুক সমালোচনায় কান দেবেন না	১৮৮
উপসংহার	১৯৬

## সকালটা হোক নতুন কিছু শুরু

জীবন স্বপ্নের নাম, আশারও নাম। এক পলকের জীবনে মানুষের আশার যেমন শেষ থাকে না, তেমনি থাকে না স্বপ্নেরও সীমানা। হয়তো কোনো স্বপ্ন পূরণ হয়, আবার হয়তো কোনোটা হয় না। তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে, আশার বসতিও গড়ে।

আমরা অনেক স্বপ্নই দেখি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার দেখা স্বপ্ন কোনটি, বলুন তো? একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন। নতুন ভোরের স্বপ্ন। নতুন একটা শুরুর স্বপ্ন।

জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে সবাই বুঝতে পারি—নাহ, আমার জীবনটা ঠিক পথে চলছে না। একটুখানি গুছিয়ে নেওয়া দরকার। দরকার একটু নিয়ন্ত্রণ, নতুন কিছু একটা শুরু।

সমস্যা হলো, বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই এই স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যায়। আটপৌড়ে ক্লান্ত জীবনকে কেউ ঠ্যালাগাড়ির মতো ঠেলতে ঠেলতেই পার করে দিই, কেউ আবার রূপকথার সেই দৈত্যের আশায় বসে থাকি। মনে করি প্রদীপ ঘষা দিলেই দৈত্য বাইরে বেরিয়ে আসবে। হাতজোড় করে বলবে— ‘আদেশ করুন জাহাপনা!’ আমরা আদেশ করব, আর আমাদের জীবনটা একেবারে ম্যাজিকের মতো বদলে যাবে!

আরেক দল মনে করে—হ্যাঁ, জীবনটা অবশ্যই বদলানো দরকার। তবে সেটা আজ থেকে না; নতুন বছর শুরু হোক কিংবা বছর তো চলেই গেল, জন্মদিনটা আসুক, তখন থেকে শুরু করব। দিন যায়, কথারা কথাই থাকে। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটায়। কত নতুন বছর পুরোনো হয়, কত জন্মদিন চলে যায়, শুরু করা আর হয়ে উঠে না।

আসলে এভাবে হয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন পরিবর্তন করা যায় না। জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্য চাই শক্ত একটা ধাক্কা। চাই একটি আত্মবিশ্বাসী অন্তর। চাই হার না মানা মানসিকতা। চাই চারপাশের পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ না করার দৃঢ় মনোবল। যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে জীবন-সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম, ধৈর্য ও সংযম দ্বারা জীবনের সংকটগুলোকে সম্ভাবনায় পরিণত করতে পারে, তার পক্ষেই কেবল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

কোনো বীজের বেড়ে উঠা দেখেছেন কখনো? মাটি ও ময়লার স্তূপের মধ্যে থেকেই সে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। জল-হাওয়া মেখে একদিন বড়ো হয়। ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেয় চারপাশ। তৈরি করে সুগন্ধ আর রঙের রঙিন এক জগৎ; এর নাম পরিবর্তন।

চাইলে আপনিও আপনার জীবনকে এভাবেই ময়লার স্তূপ থেকে রঙিন ফুলের বাগানে রূপান্তর করতে পারেন। ফুলের গাছ বেড়ে উঠতে যেমন জল-হাওয়া প্রয়োজন, তেমনি আপনারও প্রয়োজন আপনার ভেতরের শক্তিটুকু। হৃদয়ের শক্তি দিয়েই আপনি জীবন পরিবর্তন করতে পারেন।

ইমাম হাসান আল বান্না কত সুন্দর করেই না বলছেন—

‘যে সুখের জন্য মানুষ এত পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে সুখ কোথায় থাকে, জানো? তোমার অন্তরের ভেতর। আর যে দুঃখ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য মানুষের এত চেষ্টা, সেই দুঃখ কোথায় থাকে, জানো? তোমার অন্তরের ভেতরেই। তাই তোমরা মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর হয়ো না। মিথ্যা পেরেশানিতে ব্যস্ত হয়ো না।’

ধরুন, একটা টাইম মেশিনে করে আগামীকালকে আপনার সামনে হাজির করা হলো। কী দেখতে পাচ্ছেন? আজ আপনার যে সমস্যাগুলো আছে, সেটা আগামীকালও থাকবে, আগামী পরশুও থাকবে। কাজেই, কেন অযথাই আগামীকালের জন্য অপেক্ষা করছেন? যা করার, আজ থেকেই শুরু করে দিন না! শুভ কাজে দেরি করার কোনো মানে হয়?

‘আল্লাহ তায়ালা রাতে তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করেন—যাতে দিনে যারা পাপ করেছে, তারা তওবা করতে পারে। আর দিনে তাঁর (ক্ষমার) হাত প্রসারিত করেন—যাতে রাতে যারা পাপ করেছে, তারা যেন তওবা করতে পারে।’ মুসলিম

কাজেই নতুন করে শুরু করতে হলে এই মুহূর্ত থেকেই শুরু করে দিন। যে সমস্যাসমূহ জীবন থেকে আপনি মুক্তি চাইছেন, সেই জীবনকে আর একদিনও দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন নেই। নতুন বছরের আশায় বসে থাকার দরকারও নেই। পরিবর্তন শুরু হোক আজই, এখনই!

নবিজি বলেছেন—‘তওবাকারী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা পাওয়ার অপেক্ষা করে, কিন্তু দাঙ্গিক ব্যক্তি তওবা এড়িয়ে যায়। হে আল্লাহর বান্দারা! জেনে রেখ, তোমরা তোমাদের ভালো কাজ ও খারাপ কাজ সবই দেখতে পাবে। কাজের ভালো বা খারাপ পরিস্থিতি দেখার আগে কেউ দুনিয়া ত্যাগ করবে না। মানুষের সেই কাজগুলোতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যে কাজগুলো সে তার শেষ সময়ে করে থাকে।’ তিনি আরও বলেন—‘এই রাত ও দিন তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আখিরাতের জন্য রাত ও দিনকে যত্নের সাথে ব্যবহার করো।’ নবিজি আরও বলেন—‘তওবা করতে দেরি করো না। কারণ, মৃত্যু হঠাৎ করেই আসে।’ অতঃপর তিনি পড়লেন কুরআনের সেই আয়াত—

‘অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও সে তা দেখবে।’

সূরা আজ-জিলজাল : ৭-৮

জীবনকে সহজ করতে হলে জীবন থেকে কিছু ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। ঠিক যেমন বহুদিন পর বাসায় ফিরলে ফার্নিচারের ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়ে, তেমনি দীর্ঘকাল ভোগবাদী জীবনযাপনের ফলে আমাদের জীবনেও ধুলোর আস্তরণ পড়ে। নতুনভাবে শুরু করতে হলে এই ধুলো সাফ করতে হবে।

পরিবর্তন চাইলে সবার আগে আমাদের ভেতরটা পরিবর্তন করতে হবে। মাইন্ডসেটে পরিবর্তন আনতে হবে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব—এই কথাটা যেমন সত্য, মানুষ আবেগ দিয়ে পরিচালিত হয়—সেটাও তেমন সত্য। অনিয়ন্ত্রিত আবেগ এবং দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়া আমাদের জীবনে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানসিক অস্থিরতা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনমূলক।’ সূরা কাহাফ : ২৮

ওপরের আয়াতের ‘ফারাতা’ শব্দটা বেশ ইন্টারেস্টিং। এই শব্দ দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা আঙুরকে বোঝানো হয়। যে আঙুরগুলো গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং এগুলো আর কোনো কাজেও লাগে না।

মানুষ যখন তার চাওয়া-পাওয়া নিয়ে বেসামাল হয়, তখন তার অবস্থাও হয় ওই পড়ে থাকা আঙুরের মতোই; অকেজো ও মূল্যহীন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই নিজের নফসের পায়ে শিকল পরাতে হবে। মনের ওপর নিয়ে আসতে হবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তবেই জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানো সম্ভব।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিনের শেষে আমরা একটা লম্বা ঘুম দিই। তারপর সকালে জেগে উঠি। এমনই এক সকালে কখনো কি নিজেকে প্রশ্ন করেছি—আমরা মূলত কী চাই? সেই চাওয়ার পথে কী কী বাধা পেরোতে হবে? কীভাবে আমরা প্রতিযোগিতা ছেড়ে সবাইকে ভালোবেসে নিজের জীবনটা কাটাতে পারি? এই প্রশ্নগুলোই আপনার নতুন জীবন শুরুর প্রথম ধাপ।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমরা যেহেতু মানুষ, ভুল আমাদের হবেই। কিন্তু ইসলামে তওবার পথ সব সময়ই খোলা। নবিজি বলেন—

‘যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, আমাদের রব পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন। তিনি বলেন—“কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আমার কাছে চাইবে? আমি তার কাক্ষিত বস্তু দেবো। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।”’ বুখারি

## দিনের কাজ দিনেই শেষ করুন

আমাদের অনেক বড়ো একটা দুর্বলতা হলো—আমরা প্রায়ই ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্তমান সময়টাকে হারিয়ে ফেলি। আগামীকাল কী হবে, সেটা ভেবে আজকের দিনটা মাটি করে দিই।

একটা মানুষ যখন তার ভবিষ্যতের অবাস্তব সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে, তখন অবাস্তব স্বপ্নের লাগামছাড়া ঘোড়া তার মধ্যে একটা ভ্রান্তিবিলাস তৈরি করে। জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে মিথ্যা কল্পনার প্রলেপে রাঙিয়ে দেয়। জীবনের কঠিন সত্যকে ভুলিয়ে দেয়।

কেন আপনি আপনার দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এত বেশি বিচলিত? কেনই-বা যে দিনটি এখনও আসেনি, সেই দিনের চিন্তায় আরামকে হারাম করছেন?

প্রতিটা দিন নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন দিনের কাজ দিনেই শেষ করতে। বর্তমানে বাঁচুন, আগামীকালের চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিন।

ডেল কার্নেগি বেশ কিছু সফল মানুষের ওপর নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন— তারা মোটেও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। ভবিষ্যতের মিথ্যা সুখ-স্বপ্নেও তারা বিভোর হয়ে থাকতেন না; ছিলেন বর্তমানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা বর্তমানে বাঁচতেন। তারা দৈনন্দিন সমস্যা থেকে পালিয়ে যাননি; বরং সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করেছেন। দিনের কাজ দিনেই শেষ করতেন এবং তাদের জীবনের আগুবাঁক ছিল—দূরের সুযোগের দিকে না তাকিয়ে হাতের সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। এটা তো জানা কথা, দূরের মাঠ সব সময় একটু বেশিই সবুজ দেখায় (ইংরেজি লেখক টমাস কার্লাইলের একটি উপদেশ)!

ইয়েল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডক্টর অসিয়ার তার ছাত্র-ছাত্রীকে একটি প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরু করতে বলতেন। তিনি বলতেন—‘দিনের শুরুতে ঈশ্বরের কাছে আজকের দিনের খাবারটুকু চেয়ে নিয়ো।’

খেয়াল করুন, তিনি কিন্তু গতকালের বাসি খাবার নিয়েও কোনো অভিযোগ করেননি কিংবা পরের বর্ষায় বন্যা হয়ে সমস্ত ধানের জমি ডুবে গেলে কী খাবেন, সেই অভিযোগও করেননি। হঠাৎ আসা কোনো অর্থনৈতিক মন্দাতে চাকরি চলে গেলে কী খাবেন, সেই চিন্তাও করেননি। তিনি শুধু আজকের দিনের খাবারটুকু চেয়ে নিতে বলেছেন।

নবিজি বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা, সুস্থ শরীর এবং একদিনের জন্য যথেষ্ট খাবার নিয়ে একটা দিন পার করে, তাকে যেন পুরো পৃথিবীর সমান সম্পদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ তিরমিজি

যদি ওপরের তিনটা জিনিস আপনার থাকে—প্লিজ! হতাশ হবেন না, অকৃতজ্ঞ হবেন না, দুঃখিত হবেন না। কারণ, পৃথিবীর সর্বোচ্চ নিয়ামতটুকু এরই মধ্যে আপনি পেয়ে গেছেন।

নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য এবং একদিনের সচ্ছলতা এমন সম্পদ, আপনি চাইলে এগুলো দিয়ে আপনার জীবনটাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে পারেন।

সুস্থ দেহ এবং সুস্থ মন রহমানের কাছে থেকে পাওয়া সুন্দরতম উপহার। এই উপহারকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি দিনকে আমরা প্রোডাক্টিভ করে তুলতে পারি। যে সমস্যা এখনও সৃষ্টিই হয়নি, তাকে মিথ্যে কল্পনা দিয়ে টেনে আনার দরকার কী, বলুন তো? ভবিষ্যতের অনাগত সমস্যা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে বর্তমান নষ্ট করা কি কোনো কাজের কথা? না; বরং প্রতিটি দিন হোক আপনার জীবনের একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ দিন, নতুন সম্ভাবনার দিন।

আমাদের পিতা ইবরাহিম ﷺ কীভাবে তাঁর প্রতিটা দিন শুরু করতেন, জানেন? তিনি প্রতিদিন ভোরে উঠে বলতেন—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا خَلْقٌ جَدِيْدٌ فَافْتَحْهُ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَاخْتِمْهُ لِيْ بِسُغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ وَاَرْزُقْنِيْ فِيْهِ  
حَسَنَةً تَّقْبَلُهَا مِنِّيْ وَزَكَّاهَا وَضَعَّفْهَا لِيْ. مَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاغْفِرْهَا لِيْ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  
وَدُوْدٌ كَرِيْمٌ-

‘ইয়া আল্লাহ! তোমার অনুগত হয়ে এই দিনটা শুরু করার তাওফিক দান করো, তোমার ক্ষমা ও দয়া দিয়ে দিনটা শেষ করার সৌভাগ্য দান করো। তোমার পছন্দের একটা কাজ করার তাওফিক আমাকে দাও এবং এর সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দাও। আমার করা গুনাহগুলো মাফ করে দাও। তুমি তো মহা ক্ষমাশীল, পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।’

এবং তিনি বলতেন—‘যে ব্যক্তি এই দুআ দিয়ে সকাল শুরু করল, সে যেন তার রবের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা দিয়েই দিন শুরু করল।’

নবিজির জীবন আমাদের শেখায়, কীভাবে আলাদা আলাদা ঘটনাকে আলাদা আলাদাভাবেই দৃঢ় মনোবল ও সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে হয়। সকালে তিনি সাধারণত বলতেন—

‘নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর রাজত্বে আমরা আমাদের দিন শুরু করছি। তাঁর কোনো শরিক নেই, কোনো রব নেই তিনি ছাড়া এবং একমাত্র তাঁর দিকেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।’ তিরমিজি

আবার সন্ধ্যাতেও তিনি এটা বলেই দিন শেষ কলতেন।

কিছু মানুষ তাদের রবের কাছে থেকে পাওয়া নিয়ামতের কথা ভুলে যায়। শারীরিক সুস্থতা, নিরাপত্তা কিংবা পারিবারিক শান্তির মতো অসামান্য রহমতকে তারা অস্বীকার করে। যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; বরং ক্রমাগত টাকা, ক্ষমতা এবং সীমাহীন চাহিদা নিয়ে শুধু অভিযোগই করতে থাকে। এই অভ্যাসটা আপনার ঈমান ও আমলের জন্য কতটা ক্ষতিকর—সেটা কি আপনি জানেন?

‘একদিন এক লোক আবদুল্লাহ বিন আল আস রাঃ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—

“আমিই কি সবার মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষ নই?”

আবদুল্লাহ রাঃ জিজ্ঞেস করলেন—“তোমার স্ত্রী আছে?”

লোকটি বলল—“হ্যাঁ।”

তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—“মাথা গোঁজার মতো একটা বাড়ি কি তোমার আছে?”

লোকটি উত্তরে বলল—“হ্যাঁ।”

তখন আবদুল্লাহ রাঃ বললেন—“তাহলে তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত।”

লোকটি আরও যোগ করল—“আমার একটা দাসও আছে।”

আবদুল্লাহ রাঃ বললেন—“তাহলে তুমি তো রাজাদের অন্তর্ভুক্ত।” মুসলিম

একটা দুশ্চিন্তামুক্ত সফল জীবনের প্রথম শর্ত কি, জানেন? অল্পতে খুশি থাকা। নিজের অভাব নিয়ে অহেতুক হা-হতাশ করবেন না। নিজের যেটুকু আছে, সেটুকুর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করুন। দেখবেন, সফলতা আপনার কাছে ধরা দেবেই।

অতিরিক্ত বিভবৈভব ও আরাম-আয়েশ মানুষকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। নবিজি বলেছেন—

‘সূর্যোদয়ের পর দুজন ফেরেশতা পৃথিবীতে এসে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—“হে মানুষ! তোমার রবের দিকে এসো। যে প্রাচুর্য আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়, তার চেয়ে অল্প সম্পদ কল্যাণকর।” সন্ধ্যায় দুই ফেরেশতা আল্লাহকে বলেন—“হে আল্লাহ! তোমার পথে ব্যয়কারীকে তুমি বরকত দান করো, আর কৃপণকে তুমি ধ্বংস করে দাও।” বুখারি

এই হাদিসের শেষ অংশটুকু উদার ও দানশীল ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ দেয়, আর কৃপণের জন্য বলে শাস্তির কথা। আবার হাদিসের শুরুর অংশে বেশি সম্পদের চেয়ে বরং কম সম্পদকেই পছন্দ করার কথা বলা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় এবং সীমাহীন প্রাচুর্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এর চেয়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।



## দুঃখ যদি আসে? আসুক

ধরুন, আপনার জীবনে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। চিন্তায়, আতঙ্কে ঘুম হচ্ছে না। বারবার মনে হচ্ছে—এখন আমি কী করব, এখন আমি কী করব...

এখন আপনি কি এই ভয়ের ঘানি সারাজীবন টেনে বেড়াবেন? নাকি সাহসের সাথে সেই সমস্যাটা চিহ্নিত করে সেটার মোকাবিলা করবেন?

ডেল কার্নেগি বলেছেন—

‘নিজেকে প্রশ্ন করুন—এই পরিস্থিতিতে আপনার সাথে সবচেয়ে বাজে আর কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?

এই খারাপ সময়কে মেনে নেওয়ার জন্য যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলুন।

এবার শান্তভাবে ভাবতে বসে যান, এখন ঠিক কী করলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে?’

ধর্মীয়ভাবেই বলুন কিংবা ইহজাগতিক বিচারেই—যেকোনো সমস্যার সমাধানে এই পদ্ধতিটা বেশ কার্যকর। আরব্য সাহিত্যেও সাহসের সাথে বিপদ মোকাবিলা করে বিজয় অর্জনের বহু গল্প আমরা পড়েছি।

উইলস ক্যারিয়ার বলেছিলেন—‘যিনি বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারেন এবং নিজের চারপাশে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারেন, দিনশেষে জয়টা তারই হয়।’ যেকোনো বিপদে-আপদে পড়লে আমরা সাধারণত কী করি? কেউ হিতাহিত বোধশূন্য হয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করি। কেউ-বা আবার পাগলামি করে দুঃখকে ধামাচাপা দিতে চাই। কিন্তু এতে কি কোনো লাভ আছে? না, নেই। কারণ, এই পাগলামি আপনার খারাপ সময়টাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

নবিজি বলেছেন—

‘সত্যিকারের ধৈর্য হলো, বিপদের শুরুতে ধৈর্যধারণ করা।’ বুখারি

মানুষ হামেশাই বিপদের আশঙ্কায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। দুশ্চিন্তায় এবং অজানা আতঙ্কে তাদের মুখের হাসি উধাও হয়ে যায়। তাদের চেহারা হয় অনেকটা ফাঁসির আসামির মতো। দেখে মনে হয়, তারা বুঝি স্বয়ং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে!

এটাও আরেক কিসিমের পাগলামি। একজন ভালো মুসলিমের জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতিতেও সান্ত্বনা পাওয়ার মতো কিছু না কিছু থাকেই। জীবনের একটা দরজা যখন বন্ধ হয়, তখন সম্ভাবনার আরেকটা দরজা খুলে যায়। বন্ধ দরজা নিয়েই যদি কান্নাকাটি করতে থাকেন, তাহলে নতুন দরজার তালাটা খুলবেন কীভাবে?

নবিজি বলেছেন—

‘তোমাদের কেউ যখন কোনো বিপদে পড়বে, তখন আমাকে হারানোর কথা মনে করো (নবিজির মৃত্যুর কথা)। নিশ্চয়ই এটিই সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়।’<sup>১</sup>

মানুষ সাধারণত তার পরম আকাঙ্ক্ষিত কোনো জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা বেশি করে। আবার অনেক সময় বিরোধীপক্ষের দ্বারা অত্যাচারের ভয়েও অতিরিক্ত ভীত হয়, খুব খারাপ পরিস্থিতির আশঙ্কা করে। কিন্তু যখন সময়টা চলে আসে, তখন তো তাকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হয়।

চলুন দেখি, ডেল কার্নেগি আমাদের এই বিষয়ে কী বলছেন। ব্যবহারিক সাইকোলজির জনক প্রফেসর উইলিয়াম জেমস তার ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময়ই বলতেন—‘মেনে নাও, মানিয়ে নাও। কারণ, সংকট কাটিয়ে উঠার প্রথম ধাপই হলো সমস্যাটাকে মেনে নেওয়া এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।’

চৈনিক দার্শনিক লিন ইউটাং তার বিখ্যাত বই *দ্যা ইম্পারট্যান্স অব লিভিং-এও* একই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন—‘জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টাকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে মনে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। আমার ধারণা, এটা আমাদের চাপ অনেকখানিই কমিয়ে দিতে পারে।’

জীবনে ঘটে যাওয়া খারাপ ঘটনাগুলো মেনে নিতে না পারার জন্যই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ হতাশাগ্রস্ত ও আশাহীন জীবন কাটায়। সমস্যা যদি মেনে না-ই নিতে পারেন, তাহলে তার সমাধান করবেন কীভাবে?

সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা না করে কিংবা যথাযথ পরিশ্রম না করে সারাদিন সেটা নিয়ে মিথ্যা কল্পনায় ডুব দিয়ে কোনো লাভ আছে? এভাবে কখনো সমস্যার সমাধান হয়? বিষাদ সিন্ধুতে ডুব দিয়ে সুখের মুক্তো তুলতে কে কবে পেরেছে?

শারীরিক অসুস্থতা কিংবা দুঃখময় অতীত নিয়ে তীব্র হতাশা এবং অনিয়ন্ত্রিত শোক প্রকাশ অনেকটা আল্লাহতে অবিশ্বাস করার মতোই ব্যাপার। এই হতাশা রবের নির্ধারিত তাকদিরকে অপমান করার

<sup>১</sup>. Related by Ibn Sa'd, al-Darimi and others; through other narrations that attested to it, it is authentic, as mentioned in Al-Sahiah (106). Realted by Ibn Majah, and narrated by 'Aisha (Allah be pleased with her) in Dahih Sunan Ibn Majah (No. 1300) 3. Al-Bukhari (15); Muslim (44)

শামিল। ঈমানের দাবি হলো—সকল দুঃখ-দুর্দশা ভুলে গিয়ে জীবনটাকে সঠিকভাবে চালিয়ে নিতে হবে। দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে; তবে প্রত্যাশা থাকতে হবে অল্প। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন বিদেশে সফর করে কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্বন্ধে বলে—“তারা আমাদের কাছে থাকলে মরত না, নিহতও হতো না।” ফলে আল্লাহ এটিকে তাদের মনের অনুতাপে পরিণত করে দেন। বস্তুত আল্লাহই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেন আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার সম্যকদ্রষ্টা।’ সূরা আলে ইমরান : ১৫৬

প্রকৃত ঈমান মানুষকে দৃঢ় ও সাহসী করে তোলে। সে ঝড়ের ঝাপটা সহ্য করতে এবং ঝড়ের ঝকুটি অমান্য করে ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

যারা জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে চায়, তাদের অবশ্যই যেকোনো পরিস্থিতিতে শান্ত থেকে নিজের কাজ করে যেতে হবে।

ডেল কার্নেগি একজন লোকের গল্প বলেছিলেন। লোকটি ছিলেন আলসারের রোগী। ডাক্তার তার মৃত্যুর সময়ও বেঁধে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন জানাজার প্রস্তুতি নিতে। ডাক্তারের কথা শুনেই লোকটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সে নিজেকে বলল—‘প্রিয় জীবন, তোমার হাতে আর অল্প কিছু সময় বাকি আছে। তুমি সব সময়ই এই সুন্দর পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চেয়েছ, কিন্তু এতদিন তোমার সময় হয়নি। যেহেতু তোমার হাতে আর অল্প সময় বাকি, তাই তোমার আর দেরি না করে এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত।’

লোকটি সত্যি সত্যিই প্লেনের টিকেট কিনে ফেললেন। ডাক্তার তো পুরোপুরি হতভম্ব। বললেন—‘আপনি কি সমুদ্রে নিজের কবর খুঁড়তে যাচ্ছেন?’ লোকটি হেসে উত্তর দিলেন—‘টেনশন করবেন না ডাক্তার সাহেব। আমার কবর দেশের মাটিতেই হবে। আমি পরিবারকে কথা দিয়ে এসেছি।’ সমস্ত ভয় পায়ে ঠেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবী দেখতে।

## পথচলা হোক সত্য ও সুন্দরের সাথে

ইসলাম আমাদের চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোতে নিয়ে আসে। মননশীলতাকে সত্যের ওপর দাঁড় করায়। আবার সামাজিক জীবনেও মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে সঠিক পথে চালিত করে। পরস্পরকে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্ভুদ্ধ করে। যেকোনো ধরনের অসততা ও বিদ্বেষকে প্রতিরোধ করে।

ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর শিক্ষা। মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে সত্যের মঞ্জিলে পৌঁছে দেওয়ার শিক্ষা।

এই জন্যই ইসলাম সকল সুন্দর বিষয়গুলো নিয়ে আগমন করেছে, আর সকল খারাপ জিনিস সম্বন্ধে সতর্কতা জারি করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তোমরা বিভ্রান্ত হবে—আল্লাহ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।’ সূরা আন-নিসা : ১৭৬

অন্য সূরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।’ সূরা আলে ইমরান : ১০৩

এটা আল্লাহ তায়ালায় কাছে থেকে পরিষ্কার নির্দেশনা। আমাদের চিন্তা, প্রচেষ্টা বা কর্মপরিধি—সবকিছুই হতে হবে এই নির্দেশনা মেনে, মহান আল্লাহ তায়ালায় কাছে মাথা নত করার মাধ্যমে। না, শুধু আনুষ্ঠানিকতার জন্য না; বরং এই নির্দেশনা মানার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধি আরও বেশি সুন্দর ও কার্যকর হবে।

একটা মানুষের আশা বা নিরাশার পায়ে লাগাম পরাবে। প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে দূরে রাখবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সূরা তাওবা : ১৮

আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, সাওম পালন করাটা একজন মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। সত্যের পথে চলার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। সত্যকে মেনে নিতে শেখায়। যে ব্যক্তি এই কুরআনের মাধ্যমে তার রবের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারে না, সে তার সালাত বা সাওম থেকেও উপকৃত হতে পারে না।

তার মানে কী দাঁড়াল? যথাযথ ঈমান ও সচেতনতার সাথে না করলে সেগুলো আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সকল ধরনের অনৈতিকতা হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ, এগুলো মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে। মনকে সংকুচিত করে ফেলে। অনৈতিকতা মানুষের মধ্যে অবিচার ও অরাজকতা ছড়িয়ে দেয়। সমাজ অন্ধকারে ছেয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না, কষ্টে পতিত হবে না এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।’ সূরা ত্ব-হা : ১২৩, ১২৪, ১০৭

ধরুন, আমি চট্টগ্রাম যেতে চাই, কিন্তু আমি ভুল করে ধরেছি রাজশাহীর পথ। এখন আমি যত ভালো ড্রাইভিংই জানি না কেন, যত চেষ্টাই করি, আমি কি চট্টগ্রামে পৌঁছাতে পারব? কোনোদিনও না। ঠিক একইভাবে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চললেও অবস্থা এমনই হয়। সরল পথ ছেড়ে বিভ্রান্তির পথ বেছে নিলে বিপদ বাড়ে বই কমে না।

একজন মানুষ যখন নিজের ইচ্ছাতেই পরকীয়া করতে চায়, তখন সে আরও বেশি পেরেশানিতে পড়ে। তার উদাহরণ সেই কুকুরটার মতো, যে মাংস চুরি করতে গিয়ে যতটুকু মাংস পায়, তার দশগুণ মার খেয়ে ফেরত আসে!

এই খারাপ কাজগুলো যে শুধু কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা না; বরং এগুলো পুরো সমাজেই একটা বিপর্যয় নিয়ে আসে।

নৈতিক স্বলন আর চারিত্রিক অধঃপতন একটা জাতির মধ্যে অপরাধের হার প্রবলভাবে বাড়িয়ে দেয়। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে।

একজন মুমিনকে অবশ্যই তার সীমানটা জানতে হবে। জানতে হবে—কোথায় তার থামা উচিত। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে খেয়াল-খুশিমতো জীবন চালানো কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। যেকোনো সমস্যা সামনে এলেই তাতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াও দেখানো মুমিনের কাজ নয়। জীবনের যেকোনো পর্যায়ে—হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, রোদ-বৃষ্টি, শত্রুতা-বন্ধুত্ব, জয়-পরাজয়; যেকোনো পরিস্থিতিতেই একজন মুমিন খামখেয়ালি আচরণ করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই পরিমিত ও মার্জিত আচরণ করতে হবে।

মানুষ যেন সঠিক পথে চলে, সরল পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়, তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনের পাশাপাশি নবিজির মাধ্যমে হাদিসও আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে হালাল-হারাম সম্বন্ধে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া আছে।

এই উপদেশগুলো একজন মুমিনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম এবং এই নির্দেশনা মেনে চললে একজন মুসলিম কখনোই বিভ্রান্ত হবে না।

মানুষের কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন তাকে খুব ভালো পর্যায়ে নিতে পারে, তেমনি খুব খারাপ পর্যায়েও নামিয়ে দিতে পারে। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ আবেগপ্রবণ এবং এই আবেগ মাঝেমধ্যেই সীমানা ছাড়ে। মানুষ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইবনে আল মুকাফা বলেন— ‘একজন বিশ্বাসী মানুষের সাধারণত অধঃপতন ঘটে না। কিন্তু যদি কখনো ঘটে, তবে পচা শামুকেও তার পা কাটে।’ এই কথা থেকে বুঝতে পারি, মানুষ যেকোনো মুহূর্তেই আবেগীয় দুর্বলতার শিকার হতে পারে। দুশ্চিন্তা ও আতংকগ্রস্ত হতে পারে।

ডেল কার্নেগির মতে—প্রতিটি মানুষেরই মানসিক চাপ নেওয়ার একটা সীমা নির্ধারণ করা উচিত এবং এই সীমার অতিরিক্ত চাপ কখনোই নেওয়া উচিত না।

মানুষ ফেরেশতা না। ভুলভ্রান্তিহীন বা ঝামেলাহীন জীবন কাটানো মানুষের পক্ষে সম্ভব না। তাই ভুল করা এবং বিপদে পড়াটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়াই ভালো। বিপদ ছাড়া জীবন যেহেতু সম্ভবই না, তাহলে বিপদের কথাগুলো আবার ডায়েরিতে লিখে মাথার ওপর চাপ বাড়ানোর দরকার কী? তার চেয়ে ওসবকে পাত্তা না দিয়ে অগ্রাহ্য করুন।

অবশ্যই একজন মানুষের বিপদাপদ এড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যদি বিপদে পড়েই যান, তবে ঘাবড়ে যাবেন না; শক্ত থাকুন। বিপদে ভেঙে পড়লে আপনি আরও বেশি ডুবে যাবেন। লাভের লাভ কী হবে? মাথা ঠান্ডা রাখুন, শান্ত থাকুন। যেকোনো বিপদ থেকে উদ্ধারের প্রথম শর্তই হলো— মাথা ঠান্ডা রাখা।

## জীবনের রং, রঙের জীবন

রংধনুর সাত রং। আর জীবনের রং কয়টি? আকাশের যেমন রং বদলায় সকাল-বিকাল, মানুষের জীবনও তেমনি রং বদলায়। হাসি, আনন্দ, দুঃখ, হতাশা, কান্না... এগুলো তো জীবনেরই একেকটি রঙের নাম!

মানুষের সুখ বা দুঃখ, সন্তুষ্টি বা দুশ্চিন্তা শুধু মানুষই অনুধাবন করতে পারে। এটি এমন এক রং—যা আমরা শুধু নিজেরাই দেখতে পাই, অন্য কেউ পারে না।

অনেক সময় এই রং কি আমাদের নিজের ওপরেই নির্ভর করে না? ইচ্ছে হলেই মানুষ জীবনকে রঙে রঙে রঙিন করতেও পারে, আবার একেবারে রংহীন সাদাকালোও করতে পারে। নবিজি বলেছেন—

‘আর যারা আল্লাহ তায়ালার থেকে ভালো জিনিস আনন্দের সাথে গ্রহণ করে, অথচ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দুঃখজনক কিছু এলে সেটা আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারে না।’

একদিন তিনি এক অসুস্থ লোককে দেখতে গেলেন। লোকটি জ্বরে ভুগছিল। নবিজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—‘আল্লাহ তায়ালা চাইলে এই অসুস্থতার বিনিময়ে তোমার পাপগুলো মোচন করে দেবেন।’ লোকটি বললেন—‘বরং এই ফুটন্ত পানি শুধু একজন বৃদ্ধকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।’ নবিজি উত্তর দিলেন— ‘তাহলে সেটাই হবে।’

এই ঘটনাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখায়। কোনো ঘটনা আমরা কীভাবে গ্রহণ করছি, সেটা আমাদের ওপরেই নির্ভর করে। চাইলে আমরা কোনো কিছু ইতিবাচকভাবেও গ্রহণ করতে পারি, আবার চাইলে সবকিছু নিয়েই নেতিবাচকও হতে পারি। এটা পুরোপুরি একজন মানুষের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। নিচের আয়াতগুলো থেকে আমরা এ সম্বন্ধে আরও জানতে পারব—

‘আবার কোনো কোনো বেদুইন এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার ওপর কোনো দুর্দিন আসে কি না সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই ওপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।’ সূরা তাওবা : ৯৮

‘আর কোনো কোনো বেদুইন হলো তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিনের ওপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দুআ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তা-ই হলো তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদের নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।’ সূরা তাওবা : ৯৯

ওপরের দুটি দলই বেদুইন। তারা দুটি দল একই পরিমাণ অর্থই পরিশোধ করেছে। প্রথম দল এটাকে জরিমানা হিসেবে দেখেছে এবং আদায়কারীর অকল্যাণ কামনা করেছে। অন্যদিকে আরেক দল খুশি মনে এই দান করেছে। নিজেদের সম্পদ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে, স্রষ্টাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে দান করেছে এবং জাকাত দেওয়ার পর তারা প্রশান্তি লাভ করেছে।

সকল কাজ ও ফলাফল নির্ভর করে আমাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ডেল কার্নেগি বলেন—‘আমাদের চিন্তা-ভাবনাই ঠিক করে দেয় আমরা কোথায় যাব। মানসিকতা আর দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের জীবনের মেইন ফ্যাক্টর। এটাই আমাদের কর্মফল নির্ধারণ করে দেয়।’ অ্যামারসন বলছেন— ‘একজন মানুষ সেটাই, যা সে সারাদিন চিন্তা করে। আমি একটা কথাই বলতে পারি—সকল সমস্যার মূলে আছে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের মানসিকতা। আমাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো সঠিকভাবে চিন্তা করা। যদি আপনি এটা করতে পারেন, তাহলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করা আপনার জন্য কোনো ব্যাপারই না।’ মার্কাস অরেলিয়াস; বিখ্যাত রোমান দার্শনিক, যিনি রোম শাসন করতেন, তিনি বলেন—‘জীবন মূলত আমাদের চিন্তারই একটা প্রতিফলন মাত্র।’

আমরা যদি সুখের কিছু চিন্তা করি, তাহলে সুখী হব। দুঃখ নিয়ে চিন্তা করলে দুঃখী হব। আমরা যদি ভয়ংকর কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে ভীত হব। আবার যদি সারাদিন ব্যর্থতা নিয়েই চিন্তা করতে থাকি, তাহলে দিনশেষে ব্যর্থই হব।

সুন্দর চিন্তা শুধু ব্যক্তিই না; বরং দলকেও অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা সেনাবাহিনী যারা শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসে অবিচল, তাদের এই বিশ্বাসই তাদেরকে অন্যের ওপর বিজয়ী করবে। অস্ত্রের চেয়েও বিশ্বাস ও দৃঢ়তার শক্তি বেশি।

দৃঢ় নৈতিকতা এবং কাজের আভিজাত্য একজন মানুষকে অন্যের চেয়ে এগিয়ে দেয়। তার কাজের যথাযথ পুরস্কার এনে দেয়।

একজন আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ জীবনের কোনো প্রতিকূল পরিবেশেই থেমে থাকে না। মানসিক শক্তিতে বলীয়ান একজন ব্যক্তি তার শারীরিক দুর্বলতা বা জীবনের যেকোনো দুর্ঘটনাকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে পারে; বরং প্রতিকূলতা তাকে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা দেয়। মাঝেমধ্যে অবশ্য আত্মপরিচয়ের সংকটও তাকে সাহায্য করে। এই সংকটে নিজের ভুলত্রুটি পর্যালোচনা করে নিজেকে আরও পরিপূর্ণ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।



উন্নত মানসিকতার মানুষ জীবনে অনেক কিছুই অর্জন করতে পারে; এমনকী একজন মানুষ একটা জাতিকে পর্যন্ত পালটে দিতে পারে নিজের সুন্দর চিন্তার মাধ্যমে।

একজন মানুষ যত ওপরে ওঠে, তার দেখার দৃষ্টি তত প্রসারিত হতে থাকে। কারণ, নিচ থেকে দেখা আর আকাশ থেকে দেখা এক জিনিস নয়। আকাশ থেকে আমরা আরও স্পষ্টভাবে আমাদের চারপাশ দেখতে পাই। উন্নত চিন্তাও এভাবেই আমাদের দেখার দৃষ্টি বদলে দেয়।

সময়ের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হতে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানুষ ইত্যাদির প্রভাবে তার চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যার কারণে একজন মানুষের তরুণ বয়স আর বৃদ্ধ বয়সকে আমরা মেলাতে পারি না। সময় ও অভিজ্ঞতার আঁচড় মানুষের চিন্তার রংকে পালটে দেয়।

আমরাও আমাদের চিন্তাধারা দিয়ে সবকিছু বদলে দিতে পারি। নিজেদের অন্যের সামনে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে পারি। উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তার অনন্যতা দিয়ে আমরা মানুষের জীবনকে বদলে দিতে পারি; ঠিক যেভাবে বাতাস নদীর গতিপথ বদলে দেয়।

মানুষ চেষ্টা করলে মরুভূমির বুকে সবুজের ফুল ফোটাতে পারে। ঠিক সেভাবেই আমরাও আমাদের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফুল ফোটাতে পারি।

চলুন ডেল কার্নেগির কাছে থেকে একটা গল্প শুনে আসি—

‘এক তরুণ নিজের জীবন নিয়ে খুবই হতাশ ছিল। হতাশার অনলে দগ্ধ হয়ে সে সিদ্ধান্ত নিলো—আর বাসায় থাকবে না; ফ্লোরিডায় চলে যাবে। তার বাবা ছেলের বাড়িছাড়ার খবর পেয়ে কিছুই বললেন না। শুধু একটা চিঠি ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—“এই চিঠিটা রাখো; কিন্তু এটা এখন খুলবে না। ফ্লোরিডায় পৌঁছে তারপর খুলবে।”

আমেরিকায় তখন ভ্রমণের ভরা মৌসুম চলছিল। ছেলেটি ফ্লোরিডার ট্রেনে উঠে বসল এবং খুব সহজেই ফ্লোরিডায় পৌঁছে গেল। এরপর সে বাবার দেওয়া চিঠিটা খুলল। বাবা লিখেছে—

“বেটা, তুমি যে শান্তির খোঁজে বাড়ি থেকে চলে গেছ, সেই শান্তি ফ্লোরিডাতেও পাবে না। কারণ, তুমি শুধু নিজেই ফ্লোরিডায় যাওনি; বরং সাথে করে তোমার দুর্দশার কারণটাও নিয়ে গেছ। সেই কারণটা হলো—তুমি আর তোমার নেতিবাচক চিন্তা। নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনাই তোমাকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে রেখেছে।

প্রিয় বৎস, তোমার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে এসো। দেখবে শান্তিতে ভরে গেছে তোমার হৃদয়।”

## উদ্দেশ্য হোক আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি

প্রতি মুহূর্তে আমাদের নেওয়া প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতি সেকেন্ডে আমাদের শিরায় বয়ে চলা রক্ত আমাদের বারবার আল্লাহ তায়ালায় নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এসব নিয়ামত কত সহজেই না আমরা পেয়ে গেছি! কিন্তু সব নিয়ামতই কি এমন করে পাওয়া যায়?

আমাদের চাওয়াগুলো খুব অল্প। আমরা মনে করি, আমাদের হাতে থাকবে রূপকথার সেই প্রদীপ, যাতে ঘষা দিলেই ইচ্ছা পূরণের দৈত্য এসে হাজির হয়ে যাবে। আমরা মনে করি, পৃথিবীটা রেস্টুরেন্টের মতো। একের পর এক অর্ডার করতে থাকব, আর আমাদের সব ইচ্ছা রেডিমেট খাবারের মতো আমাদের টেবিলে এসে হাজির হবে।

হ্যাঁ, আমরা মাঝেমধ্যে কিছুটা কৃতজ্ঞ হই। কোনো কিছু পাওয়ার পর আমাদের মধ্যে একটা ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হয়। সেই অনুভূতি থেকেই কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু আমরা কখনোই এই কৃতজ্ঞতাকে পূর্ণতা দিতে পারি না। কেন? কারণ, আমরা প্রাপ্তিগুলোকে আল্লাহ তায়ালায় সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি না। বহু নিয়ামতকে আমরা নিজেদের প্রাপ্য বলেই ধরে নিয়েছি; অথচ এই নিয়ামতগুলো যে আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ রহমত, সেই কথা হামেশাই ভুলে যাই। তাই কৃতজ্ঞতার প্রকাশটাও ঠিকঠাক হয়ে উঠে না।

আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই আছে, যারা রাত-দিন রহমানের বিপুল নিয়ামতে ডুবে আছে, অথচ তারা এ সম্বন্ধে পুরোপুরি অসচেতন; এমনকী রবের প্রতি তাদের কোনো কৃতজ্ঞতা নেই। নেই এই বিপুল নিয়ামত পেয়ে একটুখানি ধন্যবাদ দেওয়ার অবকাশটুকুও। আল্লাহ তায়ালা এমন মানুষদের কথা কুরআনে বলেছেন। তিনি বারবার এসব লোকদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছেন, নিজেদের চারপাশে তাকাতে বলেছেন। কতটা নিয়ামতের মধ্যে দিয়ে তারা দিনযাপন করছে, সেই চিন্তাটা একবারের জন্য হলেও করতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছেন দেখার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? এমনভাবে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন

তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদের দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিজিক। তিনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ বরকতময়।' সূরা গাফির : ৬১-৬৪

এই আয়াতটা পড়ার পরও কি আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হব না? তাঁর অজস্র নিয়ামতের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবো না?

কোনো নিয়ামত পাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা মানুষের বড়ো একটা দায়িত্ব। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ সময়ই এই দায়িত্বটার কথা ভুলে যাই। অজস্র অভিযোগ এবং আরও পাওয়ার আশা—এই দুইয়ের ফাঁদে পড়ে আমরা যা পেয়েছি, তার শুকরিয়া আদায় করার কথা মনেই থাকে না। অনেক মানুষ তো আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করে, অথচ স্বীকারটুকুও করে না।

এই সব মানুষদের অন্তর অত্যন্ত ছোটো। আপনি তাদের জন্য জান দিয়ে দিলেও এরা আপনার বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। আপনি যদি এদের কোনো উপকার করেন, তার বিনিময়ে শীতল দৃষ্টি আর কঠোর ব্যবহার ছাড়া কিছুই পাবেন না এবং এরা কখনোই কারও ভালো কাজকে উৎসাহিত করে না।

সামান্য একটা ধন্যবাদ দিতেও এদের এত কুণ্ঠা কীসের, কে জানে! আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।' সূরা সাবা : ১৩

মানুষের অকৃতজ্ঞতার এমন অনেক বেদনাদায়ক উদাহরণ আমরা ডেল কার্নেগির লেখাতেও দেখতে পাই। এই উদাহরণগুলোর মাধ্যমে কার্নেগি আমাদের দেখিয়েছেন, মানুষের অকৃতজ্ঞতার মাত্রা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে।

ধরুন, আপনি একজন মানুষকে কোনো বিপদ থেকে বাঁচতে সাহায্য করলেন, জীবন বাঁচালেন, এখন লোকটার কী করা উচিত? একজন মানুষের জীবন বাঁচিয়ে আপনি তার কাছে থেকে অন্তত ধন্যবাদ তো আশা করবেনই, তাই না?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন স্যামুয়েল লেবোইজ; আমেরিকার একজন বিখ্যাত আইনজীবী। ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত তার ৭৮ জন মক্কেলকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কতজন তাকে ধন্যবাদ দিয়েছে, জানেন? একজনও না। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন। একজনও না। যীশুর কথাই ভাবুন! যীশু যখন দশজন কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করলেন, তখন নয়জনই কোনো কথা না বলেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। মাত্র একজন যীশুকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।

চার্লস স্কোয়াব নামের এক ভদ্রলোক একবার এক ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে বড়ো ধরনের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ক্যাশিয়ার সাহেব ভুয়া স্টক মার্কেটে টাকা লগ্নি করতে চেয়েছিলেন।

স্কোয়াব তাকে বাধা দেন। জেলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচান। অথচ এর বিনিময়ে ওই ক্যাশিয়ার তাকে গালমন্দ করেছিল; ধন্যবাদ দেওয়া তো পরের কথা!

মানুষের এই অকৃতজ্ঞতার কথা বারবার কুরআনেও এসেছে। আল্লাহ বলছেন—

‘নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।’ সূরা আদিয়াত : ৬

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অকৃতজ্ঞ। আগাছা যেমন সব জমিতেই থাকে, তেমনি অকৃতজ্ঞতাও সব মানুষের মধ্যেই থাকে। আর কৃতজ্ঞতা হলো গোলাপ ফুলের মতো। পরম যত্ন, মমতা আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এর আবাদ করতে হয়। কয়জন নিজেদের হৃদয়ে এই ফুলের আবাদ করতে পারে? এজন্যই আমরা আমাদের চারপাশে অকৃতজ্ঞতার জঞ্জাল যত দেখি, কৃতজ্ঞতার গোলাপ ততটাই কম দেখতে পাই। এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। মানুষের জন্য কিছু করলে সেই প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার কাছে চান; মানুষের কাছে চাওয়ার দরকার নেই।

আপনি কারও উপকার করলে সে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রহমানের খাতায় আপনার সেই ভালো কাজটা ঠিকই লেখা হয়ে যাবে—এটাই কি যথেষ্ট নয়? মানুষের কাছে থেকে প্রশংসা আশা করে অহেতুক কষ্ট পাওয়ার দরকার কি!

সম্ভবত কথাগুলো একটু বেশিই কঠিন ও রুক্ষ শোনাল। মানুষের অন্তর তবে কি একেবারেই ভালোবাসাশূন্য? পুরোপুরি অনুভূতিহীন? না, একেবারেই না; বরং প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই যথেষ্ট পরিমাণ মায়া-মমতা আছে। কিন্তু অনেক মানুষই ভালোবাসার প্রকাশটা ঠিকঠাকভাবে করতে পারে না। কাজেই এই ব্যাপারে আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি। ভালোবাসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা সুন্দর জীবনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমরা মানুষজনকে বোঝাতে পারি।

ইসলাম আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দেয়। কেউ কিছু দিলে ইসলাম তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বলে, তাঁকেও কিছু উপহার পাঠাতে বলে। যদি তেমন পুরস্কার দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দাতাকে ধন্যবাদ জানাতে বলে। ইসলাম আরও বলে—এমন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে, যেন আপনিও অন্যকে ভালো উপহার দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন।

## এই পৃথিবীতে আপনি অনন্য একজন



ছেলেবেলার এক শিক্ষকের প্রতি আমার অন্যরকম একটা মুগ্ধতা কাজ করত। আমি সব সময়ই তাঁর মতো হতে চাইতাম। কারণ, আমার এ পর্যন্ত আসার পেছনে তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে আমি কখনোই ভুলেও তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি। অনুকরণ মানুষের স্বকীয়তাকে ধ্বংস করে।

তবে আমার অনেক কাছের বন্ধুই এই কাজটা করত। তারা স্যারকে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুকরণ করত। এতে তাদের স্বকীয়তা যেমন নষ্ট হতো, তেমনি তাদের আচার-আচরণ অনেকটাই মেকি অভিনয়ের মতো হয়ে যেত; তাতে স্বাভাবিকতার লেশমাত্র ছিল না।


মঝেমধ্যেই আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে করে, মানুষ কেন এমন করে? কেন অন্যের মতো হওয়ার এই নিরন্তর চেষ্টা? আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিটি বান্দাকে আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। আলাদা চেহারা, আলাদা গড়ন, আলাদা বুদ্ধিমত্তার মিশেলে প্রতিটা মানুষই একেকজন স্পেশাল ওয়ান। কেন নিজের স্পেশালিটি বিসর্জন দিয়ে অন্যের মতো হতেই হবে?

আজ পর্যন্ত কোনো খেজুর গাছকে দেখেছেন, আমগাছ হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে? না, দেখেননি। কারণ, প্রকৃতিতে সবারই আলাদা আলাদা কাজ আছে, অনন্যতা আছে। অন্যের মতো হতে চাওয়ার মধ্যে সফলতা নেই; সফলতা আছে নিজের ভেতরের বিশেষত্বটাকে খুঁজে বের করার মধ্যে। নবিজির শিক্ষাও এমনই ছিল। বদরের যুদ্ধে বন্দিদের কী করা যায়, সেটা নিয়ে নবিজি পরামর্শ করতে বসলেন। আলোচনায় আবু বকর রাঃ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই বন্দিদের ক্ষমা করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন, আর উমর রাঃ শাস্তির পক্ষে মত দিলেন। নবিজি তাঁদের দুজনের পরামর্শই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর দুজনের মতামতই যে কুরআনসম্মত—সেটাও বললেন। তিনি আবু বকর রাঃ-এর পরামর্শ সম্বন্ধে তিলাওয়াত করলেন—

‘হে পালনকর্তা! এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ সূরা ইবরাহিম : ৩৬

আর উমর -এর পরামর্শ শুনে তিলাওয়াত করলেন আরেকটা আয়াত, যেখানে নুহ  আল্লাহকে বলছেন—

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি পৃথিবীতে কোনো কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিয়ো না। তুমি যদি তাদের রেহাই দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাদের গোমরাহ করে দেবে, আর কেবল পাপাচারী কাফির জন্ম দিতে থাকবে।’ সূরা নুহ : ২৬-২৭

খেয়াল করুন, একই বিষয়ে দুজন শ্রেষ্ঠ সাহাবি দুই ধরনের মত দিলেন। এটাই স্বাভাবিক, দুজন মানুষের মত আলাদা হতেই পারে। তার মানে এই না তাঁরা ভুল। আবু বকর ও উমর  ছিলেন সিরাতল মুস্তাকিমেরই দুজন অগ্রগামী পথিক। তবে তাঁদের প্রকৃতিতে পার্থক্য ছিল এবং এই জন্যই একই বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে আলাদা আলাদা। একজন ক্ষমার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, আরেকজন শাস্তির পক্ষে। আল্লাহ এভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেন। একজনের সাথে আরেকজনের এই পার্থক্যটাও আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি করা।

নবিজির চারপাশের মানুষগুলোও ছিলেন অসাধারণ। নবিজির ছোঁয়ায় তাঁদের ভেতর পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর গুণের সম্মিলন ঘটেছিল, কিন্তু এরপরও তাঁরা ছিলেন একেকজন একেক ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কেউ কিছুটা কোমল, কেউ কিছুটা কঠোর। নবিজি কখনোই কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ এই আলাপেই যাননি; বরং তিনি তাঁদের সব পরামর্শই মন দিয়ে শুনতেন।

আহা! আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যদি এই সত্যটা মেনে নিতে পারতেন, কতই না ভালো হতো!

সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকজনকে পছন্দ করেন না। তারা এমন মানুষদেরই পছন্দ করেন, যারা সব কথায় তাদের সাথে জি হুজুর জি হুজুর করবে।

## ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তবতার সংঘাত

ইসলামে মুখ ও মুখোশের কোনো জায়গা নেই। ভেতরের কদাকার রূপ রংচঙে পোশাকে ঢেকে মানুষের সামনে নিজেকে মহান করে তুললেই আপনি মহান হয়ে যাবেন না। কঠিন বাস্তবতাকে কি কখনো মিথ্যা রঙের আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায়?

ইসলাম অবশ্যই মানুষের পারফেকশনকে গুরুত্ব দেয়। মানুষের মাহাত্ম্যকে সম্মান করে। তবে সেই পারফেকশন আসতে হবে হৃদয় থেকে। আপনার অন্তর যদি হয় স্বচ্ছ, নির্যাতিত হয় পবিত্র এবং আপনি যদি হন সিরাতুল মুস্তাকিমের একজন আলোকিত পথিক, তাহলেই নিজেকে একজন পারফেক্ট ব্যক্তি হিসেবে দাবি করতে পারেন।

মানুষকে তুলনা করা যায় স্মার্টফোনের সঙ্গে। স্মার্টফোন যেমন চারপাশ থেকে নেটওয়ার্কের তরঙ্গ গ্রহণ করে, মানুষও তেমনি পরিবেশ থেকে ভালো বা খারাপ কাজের উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখন একটা স্মার্টফোন কতটা ভালোভাবে নেটওয়ার্ক নিতে পারবে—সেটা যেমন নির্ভর করে মোবাইলের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ওপরে—তেমনি মানুষও পরিবেশ থেকে ভালোটা নেবে নাকি খারাপটা, সেটা নির্ভর করে মানুষের হৃদয়ের ওপর।

একটা আলোকিত হৃদয়কে কোনো কিছুই সাথেই তুলনা করা সম্ভব না। চারপাশের পরিবেশ যত খারাপই হোক, আপনার অন্তরই শুধু পারে আপনাকে যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে রাখতে। কারণ, ঈমানদীপ্ত হৃদয়ে পাপের কোনো জায়গা থাকে না। পাপ সেখানে বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তার আধিপত্য চলে না তাদের ওপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের ওপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।’ সূরা আন-নাহল : ৯৯-১০০

অর্থাৎ আপনার হৃদয় যদি ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে শয়তান আপনার ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কিন্তু যদি উলটোটা হয়? যদি আপনার অন্তর দুর্বল হয়, তখন কী হবে? যদি আপনার হৃদয়ে ঈমান না থাকে, তবে আপনি শয়তান দিয়ে ঘেরাও হয়ে যাবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আপনি কি লক্ষ করেননি, আমি কাফিরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি? তারা তাদের বিশেষভাবে (মন্দ কর্মে) উৎসাহিত করে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র।’ সূরা মারইয়াম : ৮৩-৮৪

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সকল ধরনের পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে বিশুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে সৎ কাজ, যথাযথ ইবাদত এবং অবিরাম সত্যের পথে চলার মাধ্যমে অভিশপ্ত শয়তান থেকে বেঁচে থাকার কথা বলেছেন। এমনকী শয়তানের হাত থেকে বান্দাদের রক্ষা করার জন্য তিনি পুরো একটা সূরাও নাজিল করেছেন। সূরা নাসে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

‘বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বারবার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনদের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।’ সূরা নাস

এই সূরা থেকে আমরা দেখতে পাই—কীভাবে একজন মুমিন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় থাকতে পারে। কীভাবে তাদের পরিশুদ্ধ অন্তর এবং ঈমানি চেতনা শয়তানকে প্রতিহত করতে পারে। তবে শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে হলে দুআর সাথে সাথে নিজেকেও চেষ্টা করতে হবে।

একটা উদাহরণ দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ধরুন, একজন কৃষক তার ফসলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। এখন কৃষকের দায়িত্ব কী? শুধু দুআ করা? নাকি দুআর সাথে সাথে কোদাল হাতে খেতে যাওয়া এবং বাঁধ দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা? কিংবা ধরুন একজন ছাত্র। সামনে তার পরীক্ষা। আল্লাহর কাছে খুব করে চাইল সে যেন জিপিএ ৫ পায়, কিন্তু লেখাপড়াতে তার কোনো মন নেই। কম্পিউটার গেমস আর ফেসবুকেই তার সারাটা দিন কেটে যায়। তাহলে তার সেই চাওয়ার কোনো মূল্য আছে?

আপনি একটা জিনিস কতটা মন থেকে চাইছেন, সেটা আপনার চেষ্টা দেখেই বোঝা যায়। কাজেই, আপনি যখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চান, তখন আপনার উচিত শয়তান আসার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। খারাপ চিন্তাগুলো মাথাতেই ঢুকতে না দেওয়া। ইবাদতে মনোযোগ আরও বেশি বাড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু আপনি যদি একদিকে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চান, আবার অন্যদিকে নিজের নফসের গোলামি করতে থাকেন, তবে সেটা হবে আপনার একটা ব্যর্থতা। আল্লাহ আপনার এই খামখেয়ালি প্রার্থনা কবুল করবেন না।



## নবিজির আধ্যাত্মিকতা

মানুষের মন সাধারণত সদা পরিবর্তনশীল। একসময় খুব শান্ত, স্থির, আত্মবিশ্বাসী থাকে তো কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো তলানিতে নেমে যায়। অস্থিরতা গ্রাস করতে শুরু করে। কিন্তু মহান মানুষদের ক্ষেত্রে এমন হয় না। মহান মানুষরা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। প্রতিকূল পরিবেশেও সর্বোচ্চ সচেতনতার সাথে কাজ করতে পারেন। নিজেদের কাজের প্রতি তাদের প্রতিজ্ঞা থাকে পাহাড়ের মতো শক্ত। কোনো কিছুই তাদের কাজ এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

আল্লাহ মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই এমনটি হয়ে আসছে। কেউ হয় সাধারণ মানুষ; নিজের চাওয়া-পাওয়ার জালে আটকে থেকেই জীবন পার করে দেয়। আবার কেউ বিশেষ মানুষ; যারা এই সাধারণ মানুষদের বন্দিত্ব ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দেয়।

তবে এই বিশেষ মানুষদের মধ্যেও তফাত আছে। তাকওয়া, মেধা, উদারতার কারণে তফাত সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ মানুষদের ভেতর থেকে সেরা মানুষগুলোই আল্লাহর পয়গম্বরের দায়িত্ব পান। নবিরূপে সব সময়ের জন্যই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের মধ্যে সকল ভালো গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটে। সাধারণ পৃথিবীতে তাঁরা অসাধারণ গুণে গুণান্বিত এক চরিত্র হয়ে আসেন।

নবি-রাসূলগণ শুধু তাঁদের সময়ের জন্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন—এমনটা ভাবা ভুল; বরং নবিদের চারিত্রিক গুণাবলি যেমন সেই যুগেও অনন্য ছিল, তেমনি এই আধুনিক যুগেও সে সকল গুণাবলি অনন্য। তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা ছিল বলেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। কারণ, একটা জাতির নেতৃত্ব শুধু তাকেই দেওয়া হয়, যার সেই মানসিক ক্ষমতা থাকে, যিনি হাজারো মানুষকে নির্দেশনা দিতে পারেন, প্রভাবিত করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। আমি তাঁদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। আর তাঁরা আমার কাছে মনোনীত ও সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।’ সূরা সাদ : ৪৫-৪৭

মনোনীত কথাটার অর্থ কী? এর অর্থ হলো—এমন কাউকে আল্লাহর বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া, যাদের এই বাণী বহন করার যোগ্যতা আছে। নবিজির পূর্বে যে নবিগণ এসেছিলেন, তাঁরা কেবল নির্দিষ্ট একটা জাতির কাছে, নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ সময় কিংবা জাতির এই বাঁধন থেকে মুক্ত। কারণ, তিনি এসেছেন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত জাতির জন্য। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে হিদায়াতস্বরূপ মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে এসেছেন, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন।

কাজেই, সকল মহান মানুষের মধ্যে নবিজিই শ্রেষ্ঠতম মানুষ; যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রচারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ কিতাব প্রচার করার জন্য আমাদের নবিজিকেই মনোনীত করেছেন। এর অর্থই হলো—জীবন, আদর্শ বা চারিত্রিক গুণাবলি কিংবা নেতৃত্ব—কোনো কিছুতেই তাঁর চেয়ে ভালো কেউ নেই। প্রথম বা শেষ প্রজন্ম, সবার জন্যই তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় চরিত্র।

নবিজি সকল মানবীয় গুণের সর্বোত্তম এক উদাহরণ হয়ে ছিলেন আমাদের কাছে। তাঁর জীবনটাই ছিল ইসলামের এক অনুপম প্রদর্শনী। কুরআনে যেমন তাঁর বর্ণনা পাই, তেমনি হাদিসের মাধ্যমেও আমরা নবিজির অসাধারণ চরিত্র দেখি। তাঁর সিরাতগ্রন্থ পড়লেই তাঁর মহানুভবতা এবং অসাধারণ চরিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একজন অনুতপ্ত পাপী—যে তওবা করতে চায়, একজন বিভ্রান্ত পথিক—যে তার জীবনে চলার জন্য সঠিক পথের সন্ধান করছে, একজন জ্ঞানান্বেষী—যে জীবনভর জ্ঞানের খোঁজ করছে, একজন বিহ্বল মানুষ—যে তার জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধাতে ভুগছে কিংবা এক পাপী বান্দা—যে আবার তার রবের কাছে ফিরতে চায়, তাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে আল কুরআন। রয়েছে আল হাদিস। কুরআনের নির্দেশনা আর রাসূলের হাদিস সকল পথিককেই সঠিক পথের সন্ধান দেয়। পৌঁছে দেয় সফলতার মঞ্জিলে।